সমকাল

তারিখ ... 23 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৯ ... কলাম ... ২ ...

সুশিক্ষাই মুক্তি আনে

অভয় দিলে বলতে পারি

মাকিদ হায়দার

কবি

আমাদের পাবনা জিলা স্কুলের জনাকয়েক শিক্ষক ও গোপাল ইনস্টিটিউশনের দু-তিনজন শিক্ষকের যেন কর্মই ছিল ছাত্রদের শাস্তি দেওয়া, বেত্রাঘাতসহ অন্যান্য ক্রিয়া। আমি ছাত্র খারাপ না হলেও ওই ক্রিয়া থেকে রেহাই পাইনি, ওই দুটি স্কুলেরই ছাত্রের সুবাদে। কান দুটির ওপর যাচ্ছেতাই রকম অত্যাচার করেছিলেন আমার স্কুলজীবনের প্রিয় শিক্ষকরা বাদেও অগ্রজরা। সামান্য দুষ্টুমিতেই কান ধরে একটু জোরেই ডলা দিতেন মনের সুখে। চিমটি কাটা, চুল ধরে টানাটানি ছিল অগ্রজদের নিত্যদিনের কাজের একটি। লঘু অপরাধে পিতা মাঝে মধ্যে কান ধরে ওঠবস করাতেন। তবে সেকালের স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের পিতারা স্কুলে গিয়েই প্রবীণ শিক্ষকদের অবাধ অনুমতি নিশ্চয়ই দিয়েছিলেন, যেন তাদের ছেলেমেয়েদের পড়ালেখা ঠিকমতো হয়। প্রয়োজনে হাত দিয়ে চড়-থাপ্পড়, কান ধরে ওঠবস করানো, হাইবেঞ্চের ওপর কান ধরে দাঁড় করিয়ে রাখা, এমনকি দুই আঙুলের ভেতর কাঠ পেন্সিল ঢুকিয়ে দিয়ে সামান্য সময় চাপ দিয়ে বলে দিতেন– আগামীকাল যেন ইংরেজি পড়াটা ঠিক করে আসা হয়। ওইদিন গেলেও পরের দিন অঙ্কের রমেশ স্যার অঙ্ক না পারার অপরাধে নিলডাউনসহ মাঝে মধ্যে ব্ল্যাক বোর্ডের সমস্ত অঙ্ক মুছে দিয়ে, হাতের ডাস্টার ফেলে দিয়ে রাগে-অভিমানে, তাকে বলতে শুনেছি খামোখা গাধাদের কেন অঙ্ক শেখাতে এসেছি, সে কথা শুধু ভগবানই জানেন। তবে আমাদের ওই পাবনা জিলা স্কুলের হেডমাস্টার সত্যেন পাল (এমকম ক্যাল) এবং পাবনা গোপাল চন্দ্র ইনস্টিটিউটশনের প্রধান শিক্ষক মথুর চন্দ্র মুখোপাধ্যায় (এমএসসি ক্যাল.) তারা কোনো দিনই নিচের ক্লাসের ছাত্রদের কোনো ক্লাস না নিলেও খবর রাখতেন তৃতীয় শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণির ছাত্রদের লেখাপড়ার; বোধহয় প্রতিটি স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের দায়িত্ব সেটাই ছিল সেকালে। আমি আমার চাকরিজীবনে ওই রকম একজন প্রধান শিক্ষকের নাম শুনেছিলাম, সেবার যশোরে গিয়ে আমার এক কৃতী অফিসার এবং কৃতী শিক্ষকের, কৃতী ছাত্রের কাছ থেকে। তিনি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে বলেছিলেন সেই প্রধান শিক্ষকের যাবতীয় গুণের কথা, যা আমার ওই অফিসারটির জীবনের পাথেয় হয়ে আছে।

চাকরিসূত্রে সেবার বেশ কয়েকদিন থাকতে হয়েছিল আমাদের যশোরের ঝুমঝুমপুরের রেস্ট হাউসে। একদিন বৃহত্তর যশোরের শিক্ষা, শিক্ষা বোর্ড এবং কলেজ, স্কুল নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল, বৃষ্টি ভেজা দিনে। হঠাৎ সেই সুবেশী সুদর্শন অফিসারটির কাছ থেকে জানতে চেয়েছিলাম তার স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের কথা। সলাজ হেসে তিনি জানালেন, স্কুলজীবনের স্মৃতি, সবচেয়ে মধুময়, সেসব বন্ধুবান্ধব এবং সেসব শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকের কথা। মনের অগোচরে প্রায়ই জেগে ওঠে, এখন দেখি ৪-৫ বছরের শিশু ঘাড়ে-পিঠে পানির বোতলসহ ৫-৬ কেজি বই কোনো রকমে টেনে নিয়ে স্কুলে ঢুকছে। উৎসাহী পিতা-মাতা একবারের জন্যও ভাবছেন না তাদের ফেলে আসা স্কুলজীবনের কথা। এমনকি আমি নিজে দিন কয়েক খুব কষ্ট পেয়েছিলাম আমার বড় মেয়েটিকে দেখে, অথচ সেই শৈশব, কৈশোরের ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিলেন, পিতা আমাকে তৃতীয় শ্রেণিতে আর অগ্রজকে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি করিয়ে সোজাসুজি চলে গিয়েছিলেন আমাদের সবার প্রিয় হেডমাস্টার এম আলফাজ উদ্দিন স্যারের রুমে।

অফিসারের কাছে হাস্যোচ্ছলে জানতে চেয়েছিলাম– তোমাদের স্কুলের কোনো শিক্ষক কি কোনো দিন কান ধরে ওঠবস করিয়েছিলেন কি-না? সলাজ হেসে জানালেন, হিন্দু-মুসলমান

কোনো শিক্ষকই ছাড় দিতেন না, ক্লাসে পড়া না পারলে, কড়া নির্দেশ ছিল হেড স্যারের, পড়ালেখা না করতে চাইলে সেসব অমনোযোগী ছাত্রের বাড়িতে চলে যেতেন আমাদের প্রিয় হেড স্যার এম আলফাজ উদ্দিন! এখন কি কোনো শিক্ষক– তাকে আমি থামিয়ে দিয়ে বললাম, আমাকে বলতে হবে, কান ডলা, কান মলা, কান ধরে ওঠবস স্কুলজীবনে কতবার খেয়েছ, করেছ? হাস্যপ্রিয় অফিসারটি হেসেই জানালেন, সে তো অগুনতি। পরে শুনেছিলাম স্কুলের হেড স্যারকে সব ছাত্রের পিতারা এসে ভর্তির দিনেই বলে দিতেন– আমাদের ছেলের লেখাপড়ার জন্য যা করার তাই করবেন, শুধু প্রাণটা ওর যেন দেহে থাকে। হেড স্যার সেই কথাগুলো হয়তো বলে দিতেন নিচের ক্লাসের স্যারদের।

ঢাকা বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে তৎকালীন পূর্ব বাংলার সব ছাত্রছাত্রীকে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক, স্নাতকোত্তর পরীক্ষাই দিতে হতো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে। সেই তিরিশ-চল্লিশের দশকে যেসব ছাত্রছাত্রী কৃতিত্বের সঙ্গে লেখাপড়া শেষ করতেন, তাদের অনেকেরই পছন্দ ছিল শিক্ষকতা। সেই ধারাবাহিকতায় হরিণাকুণ্ডু হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক হয়েছিলেন এম আলফাজ উদ্দিন। বোধ করি ষাটের দশকের শুরু থেকেই। দেশ ভাগের পর পঞ্চাশের দশকের দিকে রাজশাহী, যশোর, কুমিল্লা বোর্ড বানিয়েছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকার। অফিসারটি জানালেন, আমি যশোর বোর্ড থেকে মাধ্যমিকে দ্বিতীয় শ্রেণি পেলেও আমার অগ্রজ প্রথম শ্রেণিসহ স্টার মার্কস পেয়েছিলেন, তিনিও। পরে এই যশোরের একটি বেসরকারি কলেজের ইংরেজির শিক্ষক হয়েছিলেন। আমাদের সেই অগ্রজ ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে গিয়ে আর ফিরে আসেননি। তিনি একজন শহীদ মুক্তিযোদ্ধা।

আমাদের আলফাজ উদ্দিন হেড স্যার জানতেন কোন ছাত্রটি মাধ্যমিকে ভালো করবে এবং কোন ছাত্রের পিতার রয়েছে আর্থিক অনটন। এমনকি যশোর বোর্ডে মাধ্যমিকের ফি দিতে পারবেন না সেটিও তিনি জানতেন। আমরা শুনেছি তিনি তার নিজ বেতন থেকে বোর্ডের ফি দিয়েছেন সেই ছাত্রের জন্য। যারা ভবিষ্যতে উন্নতি করে দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে। এমনও শুনেছি, এক ছাত্র টেস্টের পর স্যারকে বলেছিলেন, আরও ভালো রেজাল্ট করতে চাই, তাই আমাকে যদি একটু ইংরেজি শেখাতেন। প্রধান শিক্ষক তখনই সম্মতি জানিয়ে আরও নাকি বলেছিলেন, তোদের মতো ইংরেজিতে যারা কাঁচা আছিস, তোরা সবাই স্কুল ছুটির পর আমার কাছে ইংরেজি গ্রামার শিখবি। সেসব ছাত্রের ভেতর আমার অগ্রজ ছিলেন একজন। তার আরেক ছাত্র আবদুর রশিদ এদিক-সেদিক গিয়ে বিড়ি-সিগারেট খেতেন। এমনকি তাস-পাশাও খেলতেন। আমাদের সিনিয়র সেই আবদুর রশিদ ভাইকে একদিন প্রকাশ্যে স্কুল মাঠের ভেতর কান ধরে ওঠবস করিয়েছিলেন অধীর স্যার আর দিলীপ স্যার। হেডমাস্টারের নির্দেশে। হেড স্যার সচক্ষে দেখেছিলেন বিড়ি-সিগারেট খেতে তাস-পাশা খেলতে। রশিদ ভাই লজ্জায় দীর্ঘদিন আর স্কুলে আসেননি, দশম শ্রেণির ছাত্রের অপমান, কান ধরে ওঠবস। হয়তো রশিদ ভাই সেই শোক ভুলতে না পেরে পড়ালেখাই ছেড়ে দিয়েছিলেন। হঠাৎ যশোরের আর এন রোডে (রবীন্দ্রনাথ রোড) দেখি সেই রশিদ ভাইকে। তিনি আমাকে না চিনলেও আমি ঠিকই চিনেছিলাম। রশিদ ভাই হয়েছেন পুলিশের কনস্টেবল। তখনই চোখে ভাসল কান ধরে ওঠবস করানোর সেই মর্মান্তিক দৃশ্য।

আমার স্কুলজীবনে একাধিকবার গরু, নদী এমনকি 'এ জার্নি বাই ট্রেন'-এর রচনা লিখলেও কোনো দিন কানবিষয়ক কোনো রচনাই লেখা হয়নি। এমনকি গুরুমশাইরাও বলেননি সজ্ঞানে অথবা অজ্ঞানে। স্বভাবতই পাঠকদের মনে আসতে পারে গরু, নদী, ট্রেন ভ্রমণের কথা না লিখে এই রচনা লিখলেন কেন?

সেই কেনর উত্তর হতে পারে– অতি সম্প্রতি বাংলাদেশের ওপর দিয়ে নানাবিধ দুর্যোগ যেন নিত্যদিনের ঘটনায় রূপ নিয়েছে, যার এমন কিছু ঘটনা ঘটিয়েছে মানুষ নামের একদল অমানুষ। নারায়ণগঞ্জের একটি মাধ্যমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষককে জনসমক্ষে কান ধরে ওঠবস করালেন স্থানীয় এক নেতা। চিত্রটি দেখে তখনই আমার মনে হয়েছিল, শৈশব-কৈশোরের প্রিয় শিক্ষকদের মুখচ্ছবি। এমনকি সেই মুখচ্ছবি হতে পারে ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের, হতে পারে পাবনা জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক সত্যেন পালের কিংবা পাবনা গোপাল চন্দ্র ইনস্টিটিউশনের মথুরা নাথ মুখার্জির।

নারায়ণগঞ্জের সেই প্রধান শিক্ষককে কতবার কান ধরে ওঠবস করিয়েছিলেন সেটি টিভির পর্দায় একাধিকবার না দেখালেও দর্শকদের বুঝতে অসুবিধা হয়নি, অবশ্যই ৪০-৫০ বার। ওই দৃশ্য দেখার পরে তখনই মনে পড়ল সত্যজিৎ রায়ের 'হীরক রাজার দেশ'-এর সেই মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর উক্তিগুলো– ১. 'আজ থেকে পাঠশালা বন্ধ; ২. লেখাপড়া করে যে, অনাহারে মরে সে। শিক্ষামন্ত্রীর পারিষদদের ভয়ে পাঠশালার পণ্ডিত এদিক-সেদিক পালালেও শুধু পালাতে পারেননি নারায়ণগঞ্জের সেই কৃতী শিক্ষক। যিনি প্রায় ১৭-১৮ বছর শ্রম দিয়ে দাঁড় করিয়েছেন স্কুলটিকে, সেই স্কুলের ছাত্রদের সামনেই এক নেতা বীরদর্পে জানালেন– আমি ক্ষমা চাইব না, কান ধরে ওঠবস না করালে হেডমাস্টারকে মৌলবাদীরা মেরে ফেলত। যেহেতু ওই হিন্দু শিক্ষক ইসলাম ধর্ম নিয়ে কটাক্ষ করেছিলেন। সে কথা কেউ শুনেছিলেন কি-না জানা না গেলেও হেডমাস্টার মহোদয়ের নিজ প্রাণ রক্ষার্থেই তাকে কান ধরে ওঠবস করতে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের দুটি উদ্ধৃতি প্রণিধানযোগ্য– ১. 'সে কানমলা না যায় ছাড়ানো, তার থেকে না যায় পালানো, তার বিরুদ্ধে না চলে নালিশ, তার সম্বন্ধে না আছে বিচার;' ২. 'সুশিক্ষার লক্ষণ এই যে, তাহা মানুষকে অভিভূত করে না। তাহা মানুষকে মুক্তি দান করে।' অধিক না বলাই ভালো– কখন আবার আমাকেই কান ধরে ওঠবস করতে হয় ছেলেমেয়ে, মিহির, ঐশী ও মৌ-এর সামনে।